দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১১

খন্দকার জাহিদ হাসান

[**ভূমিকাঃ** ফেব্রুয়ারী মাস বাংগালী জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনিশশ' বায়ান্ন সালে এ মাসের একুশ তারিখেই মাতৃভাষা বাংলার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার। আর আজ থেকে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটত্রিশ বছর আগে উনসত্তরের আঠারোই ফেব্রুয়ারী স্বৈরাচারী আয়ুবশাহীর লেলিয়ে দেওয়া পাক-সেনাদের হাতে শহীদ হোয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কৃতী শিক্ষক ডক্টর শাম্‌সুজ্জোহা। তাঁর মৃত্যু উনসত্তরের গণ-আন্দোলনকে অত্যন্ত বেগবান ক'রে তোলে, যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার অভ্যূদয়ের ভেতর দিয়ে।

আজকের এই ক্ষুদ্র রচনাটি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও ডক্টর জোহাসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত সকল শহীদ ভাই-বোনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলো।—লেখক।]

(প) 'ভাষা বনাম ভাষা'

স্থানঃ কোল্‌কাতা থেকে দিল্লীগামী রেলের একটি কামরা
সময়ঃ ১৯৯৩ সালের জুন মাসের কোনো একটি দিন
ব্যবহৃত ভাষাঃ বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী

*[**পটভূমিঃ** ট্রেনে চেপে কোলকাতা থেকে চলেছিলাম দিল্লী অভিমুখে। আমার ঠিক পাশের আসনগুলো জুড়েই সপরিবারে বসেছিলেন আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোকের সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ-ছয় বছর বয়স্ক দুই পুত্রসন্তান। বাচ্চা দু'টো মাঝে মাঝেই বেশ উৎসাহ নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিলো। আমিও মৃদু হেসে হাত নেড়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিলাম। হিন্দী ভাষাতে পরিবারের সকলের মধ্যে কথাবার্তা চলছিলো। আমার কোনো সংগী-সাথী না থাকাতে শেষ পর্যন্ত আমাকে চুপচাপ বসেই থাকতে হলো। সহযাত্রীর এ দূরাবস্থা দেখে একসময় ভদ্রলোকের বোধহয় মায়া হলো। তাই দয়াপরবশ হোয়ে বরফ ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলেন তিনি।]*

ভদ্রলোকঃ (ইংরেজীতে) এই যে ভাই, আপনি কি ভারতীয়?
আমিঃ জ্বীনা, আমি বাংলাদেশী।
ভদ্রলোকঃ (এবার বাংলাতে) আমি অবশ্য একটু সন্দেহ করেছিলাম। তবে একদম নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, কারণ আপনার চেহারায় কিছুটা নেপালী ধাঁচ রয়েছে কিনা!
আমিঃ (একটু হেসে) তা হলে আপনি বাংগালী? যাক বাঁচালেন!
ভদ্রলোকঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বাড়ী কোল্‌কাতাতে। (হাত বাড়াতে বাড়াতে) আমার নাম দিব্যেন্দু সেন।

আমিঃ (করমর্দন করতে করতে) আমি জাহিদ। বাড়ী রাজশাহীতে, তবে চাকুরী করি ঢাকায়।

দিব্যেন্দু বাবুঃ আমার কর্মস্থলের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকুরী তো, বদলীর ওপরে থাকি। যেমন, এই মুহূর্তে সপরিবারে চলেছি দিল্লীতে আমার নতুন অফিসে যোগদান করতে।

আমিঃ (বেশ নীচু গলায়) কিছু মনে করবেন না দিব্যেন্দু বাবু, আপনার স্ত্রী তো অবাংগালী, না?

দিব্যেন্দু বাবুঃ ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম পরিচয় করিয়ে দিতে! ও আমার স্ত্রী রাখী, মুম্বাইয়ের মেয়ে। আর ওরা হলো আমার দুই ছেলে রঞ্জিত ও রাকেশ।

[সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পর্ব শেষ হওয়ার পর দিব্যেন্দু বাবু আবার কথা শুরু করলেন।]

দিব্যেন্দু বাবুঃ ওরা কেউ বাংলা জানে না। (সামান্য কৈফিয়ত দেওয়ার ভংগীতে) ইয়ে..., বর্তমানে আমার মধ্যে বাংগালী পরিচিতির চেয়ে সর্বভারতীয় রূপটিই বেশী প্রকট। সময়ের দাবী, যুগের চাহিদা! বুঝতেই পারছেন?

আমিঃ সে তো বটেই, সে তো বটেই!

[আমার বেশ ভাব জমে উঠলো দিব্যেন্দু বাবুর পরিবারের সকলের সংগে। সবাই খুব সাদামাটা আর বেশ আন্তরিক ধরণের মানুষ। বাসা থেকে তৈরী ক'রে আনা তাঁদের খাবারও সেধে বসলেন আমাকে। ভোজনপর্বের পর স্বভাবতঃই মনের দিক থেকে আমরা আরও নিকটবর্তী হলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বংগবন্ধু, রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো আলাপ।

অন্যদিকে আমাদের রেল-কামরায় ইতিমধ্যে আরেক ভদ্রলোকও রীতিমত আসর জমিয়ে ফেলেছিলেন। কথায় কথায় জানা গেল যে, উনি দিল্লীতে এক স্কুলের হিন্দী শিক্ষক। সবাই তাঁকে 'পন্ডিতজী' বলে সম্বোধন করছিলো। আনুমানিক পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক গৌরবর্ণ, সপ্রতিভ ও বাগ্মী এই ভদ্রলোক কখনও উঁচু, আবার কখনওবা নীচু গলায় নাটকীয় ভংগীতে চমকপ্রদ অভিব্যক্তিতে হিন্দী ভাষাতে বয়ান ক'রে চলেছিলেন একের পর এক মজার সব গল্প। আর কামরাশুদ্ধ মানুষ হাসিতে ফেটে পড়ছিলো। রসিক শ্রোতারা ছোটোখাটো মজাদার প্রশ্ন কিংবা মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে আড্ডাকে আরও প্রাণবন্ত ক'রে তুলছিলেন। আমার পাশে বসা দিব্যেন্দু বাবুও বাদ গেলেন না। সারা কামরা জুড়ে একেবারে 'কেয়া বাত্ কেয়া বাত্' অবস্থা।

আমি নিজে হিন্দী কথা বুঝতে পারলেও মুখে তেমন আসে না। তাই সেদিনকার সেই আসরটি অপেক্ষাকৃত নীরবেই উপভোগ করছিলাম। ব্যাপারটা পন্ডিতজীর নজর এড়ালো না। হঠাৎ তিনি সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালেন ও খাস্ হিন্দীতে বাত্‌চিৎ শুরু করলেন। বেচারা আমি অবশ্য ইংরেজীতেই কথা চালিয়ে গেলাম।]

পন্ডিতজীঃ আপনি কোন্ রাজ্যের লোক?

আমিঃ আমি আসলে বাংলাদেশের মানুষ।

পন্ডিতজীঃ ও তাই বলুন। তো আপনি হিন্দী জানেন না?

আমিঃ হিন্দী আমি বুঝতে পারি, তবে তেমন বলতে পারি না।

পন্ডিতজীঃ বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে তো আপনার হিন্দী বলতে পারার কথা!

আমিঃ কেন বলতে পারার কথা, তা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি পন্ডিতজী?

পন্ডিতজীঃ কেননা, হিন্দীর সাথে বাংলার অনেক মিল রয়েছে কিনা! তাছাড়া এর আগে হিন্দী-বলতে-না-পারা আর কোনো বাংলাদেশী আমার চোখে পড়েনি।

[আমি কিছু বলার আগেই এবার আমার পাশ থেকে দিব্যেন্দু বাবু কথা বলে উঠলেন।]

দিব্যেন্দু বাবুঃ কিছু মনে করবেন না পন্ডিতজী। আপনি বললেন যে, হিন্দীর সাথে বাংলার অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু তাই বলে কি আর হিন্দীভাষীরা বাংলা বলতে পারে বা বলে? তাছাড়া এর আগে আর ক'জন বাংলাদেশী আপনার চোখে পড়েছে? (জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রেই) আমি নিজে একজন ভারতীয় বাংগালী হিসেবেই বলছি যে, আমার রাজ্যেই আমি অনেক বাংগালীকে চিনি, যারা হিন্দী কথা বুঝতে পারলেও বলতে পারে না। (আমার দিকে আংগুল নির্দেশ ক'রে) আর এই ভদ্রলোক একজন বাংলাদেশী হোয়েও যে হিন্দী ভাষা বুঝতে পারেন– ভারতীয় হিসাবে এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ নয় কি?

পন্ডিতজীঃ সে কথা নয়, আমি বলছিলাম যে, হিন্দী বলতে পারলে উনাদের-ই বহুত্ সুবিধা হয়, এই আর কি!

দিব্যেন্দু বাবুঃ দেখুন পন্ডিতজী, এইসব সস্তা দোহাই দিয়েই কিন্তু পাকিস্তানীরা উনাদের ওপর চব্বিশ বছর ধরে মাতবরী করেছে। উর্দু জানার 'বহুত্ সুবিধা' কি কি, তা বাংলাদেশীরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। এখন আমরা ভারতীয়রাও যদি ঐ এক-ই ধরণের আশা মনে মনে পোষণ করতে থাকি, তা হলে সেটা কি ঠিক হবে?

পন্ডিতজীঃ (কাঁচুমাচু হোয়ে) আহা...., আপনি তো আমার কথাটাই বুঝলেন না! হিন্দী বলতে পারলে উনাদের তো কোনো লোকসান নেই, আছে কি?

দিব্যেন্দু বাবুঃ (ভাবগম্ভীর স্বরে টেনে টেনে) পন্ডিতজী, অনেক রক্তের বিনিময়ে উনারা ভাষার অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। আমরা ভারতীয়রাও এব্যাপারে উনাদেরকে সাহায্য করেছি। এখন কিসে তাঁদের লাভ আর কিসেই বা লোকসান, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা উনাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দিলেই ভালো দেখায় না কি?

[সারা কামরা জুড়ে নীরবতা নেমে এলো। সবাই যেন মনে মনে দিব্যেন্দু বাবুকেই সমর্থন করতে থাকলেন। পন্ডিতজীকেও বেশ লজ্জিত দেখালো। দিব্যেন্দু বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো। .....এবার দিব্যেন্দু বাবু নিজেই একটা হাসির গল্প শুরু করলেন।]

(বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত)

(ফ) 'ফাইন ডে'-র সংজ্ঞা কি?

স্থানঃ সিডনী
দিনঃ রোববার
তারিখঃ ১৮/০২/২০০৭
সময়ঃ সকাল সাতটা
পাত্রঃ টেন ইয়ারস্ নিউ বয় নিক্
পাত্রীঃ থার্টি ইয়ারস্ ইয়াং লেডি মার্গারেট

*[**পটভূমিঃ** আগের কথামত ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় নিক্ মার্গারেটকে ফোন করলো। মার্গারেট সেইমাত্র তাঁর কফির পেয়ালায় শেষ চুমুকটি দিয়েছিলেন। ধীরে সুস্থে ফোন ধরলেন তিনি।*

আগের মত এবারও নীচের কথোপকথনে কিছু কিছু শব্দ ইছাকৃতভাবে ইংরেজীতেই বহাল রাখা হলো। কারণ আগেই বলা হোয়েছে যে, বাংলা অনূবাদে এর আসল মজাটি পন্ড হতো।]

মার্গারেটঃ সুপ্রভাত, মার্গারেট বলছি।
নিক্ ঃ হ্যালো মার্গি, কেমন আছো? আমি কে বলোতো?
মার্গারেটঃ আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো নিক্?
নিক্ ঃ ভালোই আছি। তা হলে মনে আছে আমার কথা?
মার্গারেটঃ মনে থাকবে না কেন 'টেন ইয়ারস্ নিউ বয়'-এর কথা? .....তো কি খবর বলো। সেদিন রোববার 'গ্লোব্যাল ওয়র্মিং' ও 'ক্লাইমেট চেইঞ্জ্'-এর ওপর আমাদের রেডিওর আলোচনা অনুষ্ঠানটি কি শুনেছিলে?
নিক্ ঃ হ্যাঁ শুনেছিলাম। (অভিমানের সুরে) তোমরা তো আমাকে আলোচনায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ-ই দিলে না!
মার্গারেটঃ সে জন্য আমি দুঃখিত নিক্। কিন্তু তুমি তো জানো যে, সব কাজেই আমাদেরকে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। ....যা হোক, অনুষ্ঠানটি তোমার কেমন লেগেছে?
নিক্ ঃ ভালোই। তবে আমার কাছে মনে হোয়েছে যে, গ্লোব্যাল ওয়র্মিং সম্বন্ধে বেশীর ভাগ অংশগ্রহণকারীর ধারণাই তেমন স্পষ্ট নয়। টপিকটা ওদের জন্য একটু শক্তই ছিলো। ....আচ্ছা, এই ভয়ংকর সমস্যাটি নিয়ে তোমার নিজের কতোটুকু উদ্বেগ রয়েছে?
মার্গারেটঃ (একটু ভেবে নিয়ে) কিছুটা উদ্বেগ তো রয়েছেই। তবে আমি মনে করি যে, মানুষের ইতিহাসে অতীতেও অনেক বড়ো বড়ো সমস্যা এসেছে, আবার চলেও গেছে। তেমনি এই সমস্যার সমাধানও মানুষ একদিন ক'রে ফেলবে।
নিক্ ঃ তুমি যতো সহজে ভাবছো, ততো সহজে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ সমাধানের জন্য ঠিক এই মুহূর্তেই যে বি-শা-ল মাপের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন, আজকের পৃথিবীর

মানবজাতি তার জন্য ঠিকমত প্রস্তুত নয়। এমনকি অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও কোনো কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছে না!

মার্গারেটঃ তা হলে?

নিক্ ঃ তা হলে আর কি! মেরু প্রদেশের অনেক বরফ গলে যাবে, সাত সমুদ্রের তলায় চলে যাবে বিশ্বের বিরাট পরিমাণ স্থলভাগ- অথচ সুপেয় পানির জন্য দিকে দিকে হবে কোন্দল। পৃথিবীর স্থলভাগে অনাবৃষ্টি আর খরা হবে তীব্রতর। আকাশ-বাতাস হবে আরও উত্তপ্ত, প্রকৃতি আরও মারমুখো হোয়ে উঠবে, চারিদিকের আবহাওয়া হোয়ে যাবে একেবারেই অচেনা আর অনিশ্চিত। সুখী মানুষের সুখ হবে তিরোহিত— দুঃখী জনতার দুঃখ হবে আকাশ সমান!! .....আরও শুনতে চাও?

মার্গারেটঃ তুমি কি সেদিন এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিলে আলোচনা অনুষ্ঠানে?

নিক্ ঃ ঠিক তা নয়। এসব তো অনেকেই জানে। আসলে তোমাদের জন্য আমার একটা পরামর্শ ছিলো।

মার্গারেটঃ কিসের পরামর্শ?

নিক্ ঃ বলছি, মন দিয়ে শোনো। ব্যাপার হলোঃ এই ভয়াবহ গরমের মধ্যে রেডিওতে আবহাওয়া বার্তা ঘোষণার সময় তোমরা যখন তোতা পাখীর মত বলতে থাকো, ''টুমরো ইজ গোয়িং টু বি এ সানি এ্যান্ড্ ফাইন ডে'', তখন কানে তুলো দিতে ইচ্ছে করে!

মার্গারেটঃ কেন, ফাইন ডে হলে তা বলবো না?

নিক্ ঃ মার্গি, আমার কথা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। কথা হলো, ইংরেজী ভাষার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে শীতল দেশ ইংল্যান্ড, তাই তো? ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামার বেশ কদরের একটা ঋতু। আর সূর্যমামার দর্শনলাভও সে সব দেশে পরম সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার। রোদ উঠলে সকলের মনটা খুশীতে নেচে ওঠে। তাই রোদ-ঝল্‌মলে একটা দিন সেখানে আক্ষরিক অর্থেই ফাইন। কারণ যা কিছু সুন্দর, মনোহর, প্রীতিকর, তা-ই তো 'ফাইন'! তাই 'ফাইন ডে' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার তাদের জন্য মানানসই। কিন্তু আমাদের অস্ট্রেলিয়ার কাঠফাটা সামারে বন-পোড়ানো আর বাড়ীঘর-জ্বালানো ঝাঁ ঝাঁ রোদের অসহনীয় একটি দিনকে তোমরা যখন ক্রমাগতভাবে 'ফাইন ডে' আখ্যা দিতে থাকো, তখন তা নিতান্তই শ্রুতিকটু শোনায়! শব্দগুচ্ছের এ-রকম নির্বিচার ব্যবহার অনুচিত।

মার্গারেটঃ সে তো বুঝলাম। এখন তোমার পরামর্শটা কি, সেটাই বলো।

নিক্ ঃ বলছি। এমনিতে 'সানি এ্যান্ড্ ফাইন ডে' কথাটা ঠিক-ই আছে। কিন্তু অসহনীয় গরম দিনগুলোর ক্ষেত্রে, আমার মতে, তোমাদের বলা উচিৎ 'সানি এ্যান্ড্ হট্ ডে'!

[এতক্ষণে থামলো নিক্। ওর কথায় যথেষ্ট বিদ্রুপ মেশানো থাকলেও মার্গারেটের কেন যেন তা মোটেও খারাপ লাগলো না। ঠিক পাঁচ সেকেন্ড বিরতির পর আবার মুখ খুল্‌লো নিক্।]

নিক্ ঃ কি, তুমি রাগ করলে নাকি আমার কথায়?

মার্গারেটঃ না তো! আমার কিন্তু বেশ লাগছে তোমার কথা শুনতে। আর সন্দেহও হচ্ছে, আসলেই তোমার বয়স দশ কিনা। তবে হাতে তো আর বেশী সময় নেই। এখন-ই ব্যস্ত হোয়ে পড়তে হবে। ঠিক আছে নিক্, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ফোন করার জন্য। আমি রেডিও কর্তৃপক্ষকে তোমার পরামর্শটি শোনাবো, তবে গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারটি আমার হাতে নেই।

নিক্ ঃ কোনো অসুবিধা নেই মার্গি। আমার কথাগুলো শোনার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তোমার দিনটা আজ সুন্দরভাবে কাটুক। বিদায়!

মার্গারেটঃ তোমারও নিক্।

(কল্পনার তুলিতে আঁকা জীবনের বাস্তব ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১৮/০২/২০০৭

*[**কিছু কথাঃ** 'দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন'-কে শুধুমাত্র রম্য-রসাত্মক রচনা বলে আখ্যায়িত করাটা ভুল হবে, যা কেউ কেউ করেছেন। রম্যতা নয়, আসলে বৈচিত্রময়তাই পারম্পর্যবিহীন এই ধারাবাহিক রচনাটির মূল উপজীব্য। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, রম্যতা কখনো কখনো বৈচিত্রময়তার একটি অংশ হিসাবেও বিরাজ করে। এছাড়া ব্যংগ-বিদ্রুপ, সমকালীন জীবনবোধ, দর্শন এবং দেশ-কালভেদের ঊর্ধ্বে বাংলা সাহিত্যে আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণার অন্তর্ভুক্তিও এক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়।*

আবার কেবলমাত্র অতীত বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই এই ধারাবাহিকটির নির্মিতি- এটিও একটি অমূলক ধারণা। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা ও কল্পনার বিভিন্ন হারের সংমিশ্রণেই 'দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন' রচিত হোয়ে চলেছে। —লেখক।]